দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ১ .....

সাক্ষরতা ও উন্নয়ন

গত ৮ সেপ্টেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বিশ্বজুড়ে নিরক্ষরমুক্ত সচেতন সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘ এ দিবস পালনের সূচনা করে। ১৯৬১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবের সূত্র ধরে ১৯৬৫ সালে ৮-১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২ দিনের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইরানে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৬৭ সালে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। সেই থেকে প্রতি বছর ঐ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় ১৯৭২ সালে। তারপর থেকে বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ এই দিবসের সঙ্গে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের কর্মসূচীও যুক্ত করেছে।

সাক্ষরতা বা শিক্ষাকে আজ সারা দুনিয়াতেই আলাদা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর একটি বড় কারণ হলো, উন্নয়নকে এখন আর নিছক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। উন্নয়ন বলতে বুঝানো হয় মানুষের অগ্রগতিকে। আর মানুষের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো শিক্ষা। মানুষের অগ্রগতিই যেহেতু উন্নয়নের মাপকাঠি সুতরাং মানুষের সার্বিক উন্নয়নের বিকল্প নেই। মানুষ বা মানব উন্নয়নের প্রধান উপায় হলো শিক্ষা। মানুষ আজ সম্পদ হিসেবে গণ্য। আর দক্ষ মানব সম্পদ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন কখনই দ্রুতায়িত হতে পারে না। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না। বাংলাদেশ সঙ্গত কারণেই শিক্ষার বিস্তার ও মানব সম্পদের উন্নয়ন প্রত্যাশা করে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটতে পারেনি। সাক্ষরতার হারও বাড়েনি। বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশের ওপর। ১০ বছর আগেও এ হার উল্লেখ করার মতো ছিল না। সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির এ সাফল্য সাম্প্রতিককালের। বয়স্ক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচী এই সাফল্য এনে দিয়েছে। এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও মিলেছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করেছে। ইতোমধ্যে ৬টি জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া এমন আরও ৮টি জেলা রয়েছে যেগুলো নিরক্ষরতা মুক্তির প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে আছে। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা মুক্ত করার তৎপরতা চলছে।

নিরক্ষরতা মুক্তির ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এদেশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে অনেক দিন আগে। যতদূর জানা যায়, ১৯১৮ সালে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯২৬ সাল নাগাদ নৈশ বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০-এ। পরবর্তীতে এ কর্মসূচী স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৫৬ সালে নতুনভাবে এ কর্মসূচী শুরু হয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'শিশুদের মনে বীজ বপন করলে ফল পাওয়া যাবে পনের-বিশ বছর পরে। আর বয়স্কদের মধ্যে বীজ বপন করলে ফল ধরবে আজই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার আগে বয়স্ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ উক্তি করেছিলেন ১৯৩৭ সালে। পরিতাপ এই যে, বয়স্ক শিক্ষা আজও বাধ্যতামূলক হয়নি। আমরা মনে করি, বয়স্ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে দ্রুত জাতি সাক্ষর হয়ে উঠবে। সুতরাং তা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা উচিত।

শিক্ষিত হওয়ার পূর্বশর্ত সাক্ষর হওয়া। আমরা যদি নিজেদের শিক্ষিত জাতির অন্তর্ভুক্ত দেখতে চাই তবে অবশ্যই আগে সাক্ষর হতে হবে। সাক্ষরতা বৃদ্ধির সকল উদ্যোগ ও কর্মসূচীর গুরুত্ব এখানেই। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, শিক্ষিত জাতিই উন্নত জাতি। জাতি হিসেবে আমরা উন্নতি চাই, কাজেই আমাদের শিক্ষিত হতে হবে। আর শিক্ষিত হতে হলে সবাইকে আগে সাক্ষর হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে আমাদের বয়স্ক শিক্ষার প্রতি নজর দিতে হবে বেশী করে। সেই সঙ্গে একটি শিশুও যাতে সাক্ষরতা ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়, তার নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।